Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 56
October–December, 2018

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

Communal Harmony : An Islamic Perspective

Md. Wahidujjaman*

ABSTRACT

Communal harmony is the highly discussed issue in the contemporary era. Due to the tremendous advancement of science and technology people of one corner of the world is closely connected with the people of other corner. Being the inmates of global village it is inevitably essential to establish harmony amidst the diversity of human society. Needless to say that, peace and tranquility of society even the existence of human being, to a greater extent, is inextricably dependent on the effective maintenance of social harmony and unity. Islam is the religion which demonstrates the prominence of peace and harmony among the diversified communities of the world. This article aims to shed light on the noble principles of Islam regarding the establishment of communal harmony. To accomplish this task, the author has meticulously developed a critical study of the primary sources of Islamic Shariah, the position of Shariah regarding several issues namely protection of life and property, social and economic security, spirit of universal fraternity, freedom of individuals etc. Given the contemporary anarchic global order the author, on the basis of his research, unequivocally asserts that the inevitability of the directives of Islamic Shariah is beyond dispute.

Keywords: communal harmony, rights of non-muslims, *dawah* (preaching), religious dialogue.

* Md Wahidujjaman is an assistant professor of Islamic Studies (BCS General Education), currently he is an MPhil researcher at Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi. email: zamanibs2017@yahoo.com

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত পরিভাষা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। বিশ্বগ্রামের অধিবাসী মানব সমাজের বৈচিত্র্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা একান্ত অপরিহার্য। সমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এমনকি মানব সমাজের অস্তিত্ব বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম মানব জাতির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ইসলামের নীতিমালা তুলে ধরা। পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান পূর্বক এর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে ইসলাম প্রদত্ত মানুষের জান মালের নিরাপত্তা, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা, মানুষের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, পৃথিবীর সর্বত্র আজকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে লেলিহান শিখা জ্বলছে তা শান্তিতে পরিণত করার জন্য ইসলাম নির্দেশিত বিধি বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মূলশব্দ: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অমুসলিমদের অধিকার, দাওয়াত, ধর্মীয় সংলাপ।

ভূমিকা

ইসলাম এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থা অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও শতধা-বিভক্ত সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম ঐশী নির্দেশনায় বিশ্বমানবতাকে এমন এক সভ্যতা উপহার দেয়, যা মানুষকে মানবতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে শেখায়। ফলে ঐশ্বরিক জ্ঞানে আলোকিত হয় সমাজ; তিরোহিত হয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ধর্মীয় কলহ-বিবাদ। ইসলামের নিরন্তর প্রয়াসে মানুষ সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত গণমানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সব ধর্মের মানুষের মাঝে স্থাপন করে এক অপূর্ব মেলবন্ধন। মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রদর্শিত মূলনীতি

অনুসরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। কারণ ইসলামের আদেশ-নিষেধ গোটা মানব সমাজের সামগ্রিক সম্প্রীতি ও কল্যাণের পথ দেখায়। সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলামে রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা, সর্বজনীন মানবিক মর্যাদা, অভিন্ন মৌলিক অধিকার, সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। তাছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার। স্বাধীনভাবে পছন্দ-অপছন্দ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সমান অধিকারের নিশ্চয়তা ইসলামে রয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রখার নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। সমাজে সংঘাত-সহিংসতা ও জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে অন্যদের ধর্ম বিশ্বাসকে অসম্মান না করার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন, পালন, প্রদর্শন ও তার প্রতিফলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের বিধানে মানুষের সাংস্কৃতিক, গোষ্ঠীগত, বর্ণগত বৈচিত্র্যকে মানব জাতির সৌন্দর্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে এ বৈচিত্র্যময় মানব সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি না করে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমন্বয় সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট এলাকায় ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি অনুসরণের মাধ্যমে বসবাস করে এবং অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করে। এ গবেষণায় সম্প্রদায় শব্দ দ্বারা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়। একটি সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিমালা সে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকে পারস্পরিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ করে। একইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখে। হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সহিংসতার পরিবর্তে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক ভালোবাসা, সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে বসবাস করে। একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার না হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সামগ্রিক পরিবেশকে বুঝানো হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপরীত হলো সাম্প্রদায়িকতা। যা মূলত এমন মনোভাব, যা সমাজব্যবস্থার মত বৃহৎ পরিসরকে বাদ দিয়ে সমাজের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে বুঝিয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয়, যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে (Umar

1995, 11)। একইভাবে বলা যায় "যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সহ্য করতে পারেন না; বরং বিদ্বেষমূলক ভাব পোষণ করেন এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের উদার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে ঘৃণা করেন তিনি সাম্প্রদায়িক (Abdul Latīf 2018, 29)।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ইসলামের নীতিমালা

সর্বজনীন ইসলামী মূল্যবোধ

ইসলামের বিধান সর্ব যুগের ও সকল মানুষের কল্যাণের পথ দেখায়। এ ধর্ম কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামের সাথে সম্পৃক্ত ধর্ম নয় যেমনটি হয়েছে ইহুদার নামে ইহুদি ধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্ম, যীশু খ্রিস্টের নামে খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদি। বরং এটি একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই এর নামকরণ করেছেন ইসলাম। এটি রিসালাতের সর্বশেষ সীল মোহর; যা মূলত সকল মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধান যে সমাজে থাকবে সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে। কেননা, ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সকল মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত। যারা ইসলামের ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে মুসলিমদের দলভুক্ত হবে তারা যেমন শান্তি ও নিরাপদে থাকবে, একইভাবে যারা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় থাকবে তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড স্বাধীন ও সাবলীলভাবে সম্পাদন করতে পারবে। এখানে কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। যার ফলে সমাজের সকল মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠবে।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা দ্বারা একজন মুসলিমের জীবন পরিচালিত হয়। যা একজন মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। মানুষের মাঝে ন্যায়-অন্যায়বোধ জন্ম দেয়। মানুষকে সত্যাশ্রয়ী ও বিবেকবান হিসাবে গড়ে তোলে। এ সকল নৈতিক শিক্ষা যেমন ন্যায়বিচার (আদল), দয়া (রাহমাহ), ভালো কাজ করা (ইহসান), উদারতা, ভালোবাসা, বিনয়, সাহসিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাতেও বিদ্যমান। আবার কিছু কাজ যেগুলো ইসলামসহ অনেক ধর্মই নিষিদ্ধ করেছে। যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, অত্যাচার, ব্যভিচার, প্রতারণা, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি (Fadzil 2011, 355)।" আল-কুরআন রিসালাতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা, যার সকল বিধিবিধান সর্বজনীন, সময়োপযোগী ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

অভিন্ন উৎসমূল ও বিশ্ব পরিবারের চেতনা

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের আদি উৎস অভিন্ন। সকল মানুষই এ বিশ্ব পরিবারের সদস্য। এ পরিবারে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ইসলামে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর এবং নারী (Al-Qurān, 04:01)।

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- মানব জাতি একে অন্যের অতি আপনজন। কারণ, এক মানুষ থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে কাছীর রহ. বলেছেন,

من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونَشَرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر.

অর্থাৎ আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে গোত্র, বৈশিষ্ট্য, বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্য সহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন অতঃপর তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন ও সম্মিলন (Ibn Kathīr 1999, 1/354)।

মানবজাতি উৎপত্তির শুরু থেকেই সকলে পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ মূল থেকেই তাদের বংশ পরিচয় এক এবং অভিন্ন। এ মৌলিক সত্যটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, মানুষ যেন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা বংশ পরিচয়ের কারণে তার আসল পরিচয় ভুলে না যায়। আদি উৎসমূল একই হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করে শান্তিতে বসবাস করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ - وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾

তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, আমারই ইবাদত কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (Al-Qurān, 21:92-93)।

এ আয়াতে 'তোমরা' বলে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মানবজাতি, তোমরা আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর ফি যিলালিল কুর'আন' এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সকল নবীর উম্মতরা আসলে তোমাদেরই উম্মত। সকলের একই ধর্ম, একই আকীদা-বিশ্বাস, একই জীবনব্যবস্থা এবং তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা; অন্য কারো নয় (Qutub 1412H, 4/2395)।" হাফিয ইব্ন কাছীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

والأنبياءأخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد.

মা ভিন্ন হলেও নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের সবারই একই দীন (Al-Bukhārī 2002, 854/3443)।

ইসলামের এ সকল বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম-অমুসলিম সকলকে নিয়েই আল্লাহ তা'আলার এ বিশ্বপরিবার। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে রয়েছে সুশৃঙ্খল বন্ধন, যা কোনোভাবেই ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা উচিত নয়।

সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চেতনা

সকল সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে বসবাস করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল মানুষ আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত। একই আদমের সন্তান, একই পরিবারের সদস্য এবং একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের এ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেমন সদয় ও সহানুভূতিশীল, তেমনি বিশ্বপরিবারের সকল সদস্যের প্রতিও একইভাবে সহানুভূতিশীল ও সদয় হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।

মহানবী স. ঘোষণা করেছেন,

الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.

সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার পরিবারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারভুক্তদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। (Al-Tabarānī ND, 10/105, 10033)।

কিন্তু মানুষ বিশ্ব মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা উপেক্ষা করে নিজেদেরকে বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নানা বৃত্তে আবদ্ধ করেছে। নিজ বৃত্তের ভিতরের লোকজনকে আপন এবং বৃত্তের বাইরের লোকজনকে দূরের লোক বলে গণ্য করে। যার ফলে মানুষের মাঝে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষদের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তা তাদের মর্যাদার জন্য নয়, বরং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মাঝে বানিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন (Al-Qurān, 49:13)।

এখানে আরবী 'তা'আরাফু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ পরস্পরকে জানা, চেনা ও বোঝা। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা একে অপরকে জানবে ও বুঝবে এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বসবাস করবে।

মানবিক মর্যাদার সর্বজনীনতা

এ পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান- এ কথাগুলো কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সে আল্লাহর প্রতি অনুগত হোক কিংবা আল্লাহর অবাধ্য হোক। এ মূল্যবোধ থেকে মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা জাগ্রত হয়। সকল মানুষের মর্যাদার সর্বজনীনতার ঘোষণা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি (Al-Qurān, 17:70)।

এ প্রসঙ্গে ড. জামাল বাদাওয়ী বলেন,

মুসলিম কিংবা অমুসলিম যে কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা অপদস্ত করা কিংবা কোনো ধরনের অমানবিক আচরণ করা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, এধরনের আচরণ মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী, যা কোনোভাবেই একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়। যারা এসব কাজ করে তারা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, যে ব্যক্তি এখন আল্লাহকে অস্বীকার করছে সে যেকোনো সময় ঈমান গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধ করে সেজন্য তাকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে; কিন্তু তার মানবিক মর্যাদার অবনমন করা যাবে না। তাই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা ভাষা কোনো পরিচয়ই ইসলামের বিধান মতে মুখ্য নয়। তার আসল পরিচয় হলো মানুষ। মানুষ হিসাবে অভিন্ন মর্যাদার স্থান প্রত্যেকের রয়েছে (Al-Badawī 2016)।

কোনো মানুষই আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমত থেকে মাহরুম নয়। যেমন চন্দ্র, সূর্য, বায়ুমণ্ডল কিংবা বারিমণ্ডল থেকে মুসলিমদের জন্য বেশি আর অমুসলিমদের জন্য কম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। পার্থিব জীবনে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে মর্যাদাগত যদি কোনো পার্থাক্য থাকত, তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা আলাদা করে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা সেটা না করে সকলের কাছে স্পষ্ট এ বার্তাই দিয়েছেন যে, তোমরা সকলেই সমান। সুতরাং সকলেরই উচিত, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজে বসবাস করা।

মানব জীবনের সর্বজনীন নিরাপত্তা

মানব জীবনের গুরুত্ব নিয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো শুধু মুসলিম নয় বরং সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবন মূল্যবান ও পবিত্র। একে সম্মান করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করে এবং যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য

নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে (Al-Qurān, 05:32)।"

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তি মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক হত্যাকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কুরআনের বিধান মতে নিহতের পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন। কিসাসের বিধানটি ইসলামী আইনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পশ্চিমা আইনেও এর বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো অপরাধী যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে একবার সুযোগ দেওয়ার বিধান এ আইনেও রয়েছে। যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে আদালত কর্তৃক তার শাস্তি কার্যকর হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া কোনো রায় প্রদান ও কার্যকর করতে পারে না।

ন্যায় বিচার ও আইনে দৃষ্টিতে সমতা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী আইনে অপরাধীকে অপরাধী হিসাবেই গণ্য করা হয়। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, বংশ কিংবা অন্য কোনো পরিচয়ের কারণে কারও প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগভাজন হওয়ার সুযোগ নেই। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এখানে মুখ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না (Al-Qurān, 04:135)।

সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী ও সকল মানুষের উপর আইন সমানভাবে কার্যকর হবে।

উমর রা. এর হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সন্দেহে নিহত তিনজন অমুসলিম নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ঘটনা। এর সাথে জড়িত হল সদ্য শাহাদাতপ্রাপ্ত খলীফা উমর রা. এর ছেলে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা.। ইব্ন কাছীর রহ. এর বর্ণনায়, "উসমান রা. এর খিলাফতের প্রথম মামলাটি

হলো উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা. এর মামলা। যে মামলার রায় দিলেন আমীরুল মু'মিনীন উসমান রা.। উমর রা. আহত হবার পরদিন সকালে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা., উমর রা. এর হত্যাকারী আবু লুলুর কন্যার কাছে যান এবং তাকে হত্যা করেন। জুফাইনাহ নামক একজন খ্রিস্টানকে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। তাসতুরের শাসক আল-হুরমুজানকে তিনি আঘাত করে তাকেও হত্যা করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা এ দু'জন উমর রা. কে হত্যার ব্যাপারে আবু লুলুকে সাহায্য করেছিল (Ibn Kathīr 1988, 7/167)।" এ তিনজন ব্যক্তিই ছিল অমুসলিম। আহত উমর রা. তাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে বন্দী করার হুকুম দিয়েছিলেন। যেন পরবর্তী খলীফা এর সুষ্ঠু বিচার করতে পারেন।

উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করেছিলেন এমন অবস্থায়, যখন তাঁর পিতা তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে আবু লুলুর দ্বারা ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়ছেন। তাঁর এ হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী খলীফাগণ এ মর্মে কোনো আপস করেননি। সর্বাবস্থায় তাঁরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই উসমান রা. খলীফা হয়েই এ ব্যাপারে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা দেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ কামনা করেন। আলী রা. বলেন, 'আমার মত হলো তাঁকে হত্যা করা'। কিছু সংখ্যক মুহাজির বলেন, 'গতকাল উমর রা. শহীদ হয়েছেন, আর আজ তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে?' তখন উসমান রা. খলিফা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দেখলেন, নিহত ব্যক্তিগণের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যার উত্তরাধিকারী নেই ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারই তার উত্তরাধিকারী হয়। তাই উসমান রা. নিজেই তাদের উত্তরাধিকারী। সাধারণত হত্যাকাণ্ডের বিচার সংগঠিত হয় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দাবি অনুসারে এবং এর শাস্তি হলো কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা অথবা দিয়াত (রক্তপণ) দেয়া। উসমান রা. বললেন, "আমি তাদের অভিভাবক। আমি দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করলাম এবং আমি আমার সম্পদ থেকেই তা আদায় করবো (Al-Tabarī 1387H, 4/239)।" অপরাধের জন্য ধর্মীয় পরিচয় কিংবা ব্যক্তির অন্য যেকোনো পরিচয় আইন প্রয়োগে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। যার ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসকে অসম্মান না করা

সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো- কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা। বরং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি পারস্পরিক সম্মানবোধ সমুন্নত রাখা উচিত। প্রত্যেক মানুষ সে যা পালন করে সেটাকে সর্বোচ্চ সম্মান করে থাকে। কারও ধর্ম বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করা কিংবা কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা ইসলামের চেতনা পরিপন্থী কাজ। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে (Al-Qurān, 6:108)।

অমুসলিমরা যেসব কাজ তাদের ধর্মে হালাল বলে মনে করে ইসলাম তাদেরকে সেসব কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে না এবং তারা যেগুলোকে হারাম মনে করে তা পালন করতে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সে সমস্ত কাজ অবৈধ হলেও তাদের ধর্মমতে চর্চা করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে নবী স. কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

(বল,) তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য (Al-Qurān, 109:06)।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যদের উপাসনা করে, মূলত তা আল্লাহকে অস্বীকার করার শামিল হলেও সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক (Al-Qurān, 18:29)।

অর্থাৎ কেউ চাইলে আল্লাহর সত্য বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, আবার তা অমান্যও করতে পারে। এর জন্য কাউকে আসামি সাব্যস্ত করা যাবে না।

মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অমুসলিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে; মুসলিমদের নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন,

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ – لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾

অতএব, (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তো তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন (Al-Qurān, 88:21-22)।

কুরআনে এরকম অনেক নির্দেশনা রয়েছে, যেখানে মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকারকেও সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে আরেকদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতো খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে অর্ধেক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় (Al-Qurān, 22:40)।

এ আয়াতের শিক্ষা হলো, কোনো ধরনের ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো নিকৃষ্ট কাজ। মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এটি মানুষের আত্মপরিচয়কে নির্ণয় করে। কিন্তু বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপাসনালয়ে বোমা মারছে। ইসলামে এ সকল কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের ইতিহাস হচ্ছে, সকল ধর্মের উপাসনালয়াগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা দানের ইতিহাস। কেননা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে আল্লাহ তা'আলার নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রভুকে স্মরণ করার জন্যই তাদের স্ব-স্ব উপাসনালয়ে গমন করেন।

সকল সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহর বাণী

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছেই নবী প্রেরণ করেছেন। তাঁদের শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾

রাসূলদের কারো মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না (Al-Qurān, 02:285)।

মানুষের ইহাকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উপায় সম্পর্কে অবহিত করাই এর মূল লক্ষ্য। দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবীদের শিক্ষা ছিল আল্লাহর

একত্ববাদের প্রচার ও আল্লাহর আদেশ নিষেধের বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়া। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠবে। কিন্তু মানুষ অন্যদের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জন না করেই অহেতুক খারাপ ও মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে। অন্য ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করার কারণে খুব কম মানুষই অন্যদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এমনকি স্ব-স্ব ধর্মের তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ না করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আঁকড়ে ধরে রেখেছে। অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে অহেতুক নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করে পরস্পরকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করলে এবং স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থের মৌলিক কথাগুলো মেনে চললে সমাজের সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সহিংসতা বন্ধ হয়ে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা কাছাকাছি অবস্থানে চলে আসতো। সকলেই সকলকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো। কারণ, পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর (Al-Qurān, 16:36)।

তারপরও মানুষ নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করে। যেমন আল-কুরআনে এসেছে,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾

ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আবার খ্রিস্টানরা বলে ইহুদিরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তারা উভয় সম্প্রদায়ই কিতাব তেলাওয়াত করে (Al-Qurān, 02:113)।

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- অন্ধভাবে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ না হয়ে সকল ধর্মের সাদৃশ্যগুলোকে মেনে নিতে হবে। যাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলমন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা যায়। আল কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

বলো, হে কিতাবীগণ! এসো সেই কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই (Al-Qurān, 03:64)।

সহাবস্থান ও সদাচরণ

ইসলাম মানব জাতির সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জীবনব্যবস্থা। অমুসলিম সম্প্রদায় যদি মুসলিমদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তাহলে ইসলামের মূলনীতি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন (Al-Qurān, 60:08)।

কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া একেবারে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবেই বিবেচিত। তাই এ ধরণের কর্মকাণ্ডের সাথে যে সকল অমুসলিম জড়িত নেই তাদের প্রতি সদয় ও সহাবস্থানের কথা মুসলিমদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সমাজে বসবাসকারী অমুসলিদের সাথে সামাজিক কাজকর্ম যেমন উঠা-বসা, লেনদেন, খানাপিনা ও উপহার সামগ্রী আদান প্রদান ইত্যাদি সম্পাদন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। এসকল কাজকর্ম মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। নবী মুহাম্মদ স. বিভিন্ন সময় অমুসলিমদের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। অমুসলিমদের তৈরি খাবার তিনি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাওয়াত কবুল করেছেন। তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের বৈধ সকল ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইব্ন হুল্ব র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী স. কে নাসারাদের তৈরি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন:

لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِى صَدْرِكَ شَىْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

কোনো খাদ্য সম্পর্কে তোমার মনে অযথা সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। এ ধরনের অমূলক সংশয়ে পতিত হলে তুমি নাসারাদের মত হয়ে গেলে (Al-Tirmidī 1417H, 371, 1565; Abū Daūd 1420H, 417, 3784)।

তবে যেসকল খাদ্য ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কেবল সে খাবার গ্রহণ করা যাবে ,আর যেসকল খাদ্য তাদের বিধানে বৈধ; কিন্তু ইসলামে অবৈধ তা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মদ, শূকরের মাংস ইত্যাদি। তিনি অমুসলিমদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করেছেন। তারা নবী স. কে বিভিন্নভাবে অমানুষিক কষ্ট ও যন্ত্রণা দিলেও নবী স. তাদের থেকে প্রতিশোধ নেননি। এমনকি তাদের অভিশাপও দেননি। বরং তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন। নবী মুহাম্মদ স. এর এসকল কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করে।

উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমার রীতি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হলেন পরম করুণাময় ও দয়াশীল। আল্লাহর ইচ্ছা পৃথিবীর বুকে সকল মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করুক। তাইতো তিনি রাসূল স. এবং মুসলমানদেরকে উদার হৃদয়ের, কোমল স্বভাবের এবং সহিষ্ণু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মহানবী মুহাম্মদ স. কে নবুওয়াতের যে মহান দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাতে কিছু মানুষ ঈমান আনবেন আর কিছু মানুষ এর বিরোধী হবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাকে নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের প্রতি সহনশীল ও সহিষ্ণু হতে হবে। বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকে সহ্য করে তাদের বিরক্তিকর ও অপছন্দীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। তারা যত খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, যতই বর্বর হোক না কেন, ইসলামের আদর্শ হলো- কঠোর প্রতিক্রিয়া, কর্কশ আচরণ ও বর্বরোচিত প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদের সকল কর্মকাণ্ড ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে উদারতার পরিচয় দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো (Al-Qurān, 7:199)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

ঈমানদারদেরকে তুমি বলো, যারা আল্লাহ তা'আলার দিবসগুলোর প্রত্যাশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, এটি এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন (Al-Qurān, 45:14)।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী মুহাম্মদ স. মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে পৃথিবীর ইতিহাসে উদারতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ সময়ে এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ স.-এর জীবনাদর্শই মাইলফলক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

রাসূলের জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ (Al-Qurān, 33:21)।

ইসলামী জীবন বিধানের সর্বত্র উদারতা ও নৈতিকতার ছাপ বিদ্যমান। একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন কাজ কর্মে যেমন নিষ্ঠাবান হবেন, তেমনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেও হবেন সদা সচেষ্ট। একইভাবে তার চিন্তা-চেতনায় মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা ও মানব প্রেমের প্রতিফলন থাকবে। কেননা, এর মধ্যেই মুমিন জীবনের স্বার্থকতা ও কল্যাণ নিহিত। একজন মুমিনের জীবনে মানুষের সাথে উঠা-বসা, লেনদেন ও আচার ব্যবহারে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

একজন মুসলিমের জীবনযাপনে প্রকাশ পায় সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-আচরণ, বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাব, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার এবং উদার মানবিকতা। এই উদারতার প্রকাশ ঘটেছে মুশরিক পিতা-মাতা যখন মুসলিম সন্তানকে শিরক ও কুফরীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন তাদের সাথে করণীয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশ হলো-

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

আর পৃথিবীতে তাদের সাথে সৎভাবে বাস করবে (Al-Qurān, 31:15)।

মুসলিমদের উদারতা ও গুণাবলি বর্ণনায় আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

আহারের প্রতি তাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এয়াতীম ও বন্দিকে খাদ্য প্রদান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয় (Al-Qurān, 76:08-09)।

এখানে বন্দি বলতে অমুসলিম বন্দিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অমুসলিম পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না (Al-Qurān, 02:272)।

উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা নিষিদ্ধ

ইসলামে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলাম মধ্যমপন্থার জীবনব্যবস্থা, যার মূলনীতি অত্যন্ত উদার ও গণতান্ত্রিক। উগ্রবাদী আচরণ কিংবা উগ্রবাদী কোনো পন্থা গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামে নেই। জাতীয়তার উগ্র চেতনা মানুষদেরকে সহিংসতা ও সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। মহানবী স. উগ্রবাদী জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে বিদায় হজ্জের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেন,

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.

হে মানবমণ্ডলী! জেনে রাখ, তোমাদের প্রভূ একজন, তোমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। আরও জেনে রাখ, কোনো অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের মর্যাদা নেই। একইভাবে কালো বর্ণের মানুষের ওপর লাল বর্ণের মানুষের বা লাল বর্ণের মানুষের ওপর কালো বর্ণের মানুষের মর্যাদা নেই, শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া (Ahmad ND. 5/411, 23536)।

আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাকওয়া বা পরহেযগারী। মানুষের মাঝে গঠনগত, ভাষাগত, চিন্তা-চেতনাসহ নানা দিকে পার্থক্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এটা আল্লাহর সৃষ্টির এক অনুপম সৌন্দর্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মাঝে এ পার্থক্য নিয়ে কোনো প্রকার জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রকাশ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মুহাম্মদ স. ঘোষণা করেন,

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.

যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্ধ অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করে অথবা জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করে অতঃপর নিহত হয়, তাঁর মৃত্যুও যেন জাহেলিয়্যাতের ওপর হলো। আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে আমার উম্মতের ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকলকেই আঘাত করে, মুমিন ব্যক্তিকে ভয় করে না এবং (নিরাপত্তার) চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণ করে না, সে আমার কেউ নয় এবং আমিও তার কেউ নই (Muslim 2006, 897, 1848)।

ইসলামের এ চেতনা সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চিরতরে বিদায় করে দিয়ে একটি সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা

অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্যহীন ও ইনসাফপূর্ণ। এখানে মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকলেই বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন, ভোগ কিংবা হস্তান্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হলে প্রত্যেক নাগরিককে নির্দিষ্ট হারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান করতে হয়। মুসলিমরা এ অর্থ প্রদান করে যাকাত ব্যবস্থাপনার আওতায়। আর অমুসলিমরা প্রদান করবে জিযিয়া (কর) ব্যবস্থাপনার আওতায়। উভয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় বৈষম্য কমানো ও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মুসলিম ধনিক শ্রেণির উপর যাকাত একটি ফরয ইবাদত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী একজন মুসলিম প্রতি বছর তার সম্পদের হিসাব করে চল্লিশ ভাগের একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন। রাষ্ট্র এ অর্থ দ্বারা সমাজের দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে। যাকাতের অর্থ কেবলমাত্র মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু ব্যয়ের

জন্য খাত সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে মানুষের ধর্মের পরিচয়কে বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট কিছু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তারা সকলেই যাকাতের অর্থের মাধ্যমে সুবিধা পাবেন। যেমন আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

নিশ্চয়ই সাদাকাসমূহ দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ে কর্মরত ব্যক্তি, ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরের জন্য (Al-Qurān, 09:60)।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো মধ্যে একটি খাত অমুসলিমদের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। সেটি হলো 'মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম' অর্থাৎ সে সকল অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামের প্রতি যাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামের অন্যান্য যে সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সমাজের গোটা মানবগোষ্ঠীই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সাদাকাহ বা 'নিঃস্বার্থভাবে স্বেচ্ছায় দান কার্যক্রম'। যেকোনো অভাবী বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার দিকনির্দেশনা ইসলামে রয়েছে।

তাছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুসলিম অমুসলিম সকলেই অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন একদিন উমর রা. একজন ইয়াহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাকে সাথে নিয়ে গিয়ে বায়তুল মাল হতে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। জীবিকা উপার্জনে অক্ষম অমুসলিম ও মুসলিম নাগরিকদের বৃত্তি প্রদানে তিনি কোনোরূপ বৈষম্য করতেন না। বরং অমুসলিমদের বেলায় বেশি উদার মনোভাব দেখাতেন (Nu'mānī 2012, 202)।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার নীতি এমনভাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য তো নয়ই, বরং যা করলে ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদায় হজ্জের ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক ঘোষণা

দশম হিজরীতে নবী স. তার জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করেন। এ হজ্জ পালনকালে বিশ্ব মুসলিমের সমবেত সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। হজ্জের এই

ভাষণসমূহে বিশ্বময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশনা ও আহ্বান রয়েছে। তৎকালীন বিশ্বে জাতিভেদ, জাত্যাভিমান, উঁচু-নিচুর পার্থক্য ও ছোট বড়র তারতম্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাজার সামনে প্রজা, ধর্মগুরুর সামনে সাধারণ মানুষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে নীচ বংশীয় লোকেরা ছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হজ্জের মাধ্যমে জাহেলী সমাজের নিয়ম পদ্ধতির বিলোপ সাধনে উদ্যোগী হন। সকলের মধ্যে সমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরাইশ-অকুরাইশ নির্বিশেষে সকল হজ্জযাত্রীদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে ৯ যিলহজ্জ তারিখে সমবেত হলেন। উপস্থিত জনতার সম্মুখে ঘোষণা দিলেন,

ألا كل شئ من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

জাহেলী যুগের সমস্ত রীতি-প্রথা আমার পদতলে নিহিত (Muslim 2006, 557, 1218)।

পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন, এক পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে ধূলিসাৎ করা হলো। সমস্ত জাতিভেদ ও অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করলেন। আবু নাযরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূল স.-এর ভাষণে তিনি শুনেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.

হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কালো বর্ণের উপর লাল বর্ণের কিংবা লাল বর্ণের উপর কালো বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ ভীতি (Ahmad ND. 5/411, 23536)।

জাহেলী যুগে কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তি অন্য গোত্রের কারো দ্বারা নিহত হলে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা বংশগত কর্তব্য মনে করতো। এমনকি শত শত বৎসর অতীত হলেও তারা এই কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর থাকতো। ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি, কাটাকাটি, যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ স. এই জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করার জন্য দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দেন,

ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل.

জাহেলী যুগের সমস্ত খুন (অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার) বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের যে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম তা হলো রবী'আ ইব্ন হারিসের পুত্রের খুনের প্রতিশোধ। সে যখন বনী সা'আদ গোত্রে লালিত পালিত হচ্ছিল তখন হুযাইলের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে (Muslim 2006, 558, 1218)।

মানুষের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ বংশগত হানাহানি ও বর্ণবাদ। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় অন্তরায়। এ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে তিনি ঘোষণা দিলেন,

ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود عن والده.

সাবধান! অপরাধীই নিজ অপরাধের জন্য দায়ী। পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় এবং পুত্রের অপরাধের জন্যও পিতা দায়ী নয় (Al-Tirmidī 1417H, 488, 2159)।"

আরও বলেন,

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا.

কোন গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে (Muslim 2006, 892, 1838)।"

সর্বোপরি বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে নবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির জীবন নাশ, সম্পদ হরণ ও ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আবু নাযরাহ বলেন, "রাসূল স. (উপস্থিত জনতাকে) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? তাঁরা বলল, পবিত্র দিন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মাস? তাঁরা উত্তর দিল, পবিত্র মাস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন শহর? তারা বলল, পবিত্র শহর। তিনি বললেন,

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.

নিশ্চয় তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম মর্যাদাপূর্ণ, যেমন তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে আজকের দিনটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ (Al-Bukhārī 2002, 419, 1739)।

এরপর তিনি সমস্ত মানুষকে আখেরাতের জবাবদিহিতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবেই ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সংঘাতের মূলোৎপাটনের

নির্দেশনা প্রদান করে এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়, যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

ইসলামী আইনে জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ

ইসলামী আইনে জোর-জবরদস্তি হারাম। কেননা, বিশ্বাসের বিষয়গুলো মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। তাই জোর-জবরদস্তি করে কারো মনের বিশ্বাস পরিবর্তন করা যায় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুতকে অমান্য করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং শুনেন (Al-Qurān, 02:256)।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী মুহাম্মদ স. কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা (Al-Qurān, 42:48)।

আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছেন, যেন মানুষ তাদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি হলো- "কাউকে জবরদস্তি করে ইসলামে প্রবেশের চেষ্টা না করা। জোর-জবরদস্তি করে কোনো কিছু কারো উপর চাপিয়ে দিলে সে সুযোগ বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি দা'ঈর ক্ষতিও করতে পারে। কারণ, মানব অন্তঃকরণের স্বাভাবিক নীতি হলো, যে তার প্রতি ভলো আচরণ করল, সদয় হলো, তাকে সে ভালোবাসে, আর যে জবরদস্তি করল, তাকে সে ঘৃণা করে। ঐ জবরদস্তিকারী যে কেউ হোন না কেন (Anwārī 2005, 250)। এর ব্যতিক্রম কিছু হলে একদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে, অন্যদিকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হবে।

বিতর্ক উত্তম পন্থায় হতে হবে

ইসলাম প্রচারের অন্যতম একটি পন্থা হলো, অমুসলিমদের সাথে যুক্তিনির্ভর বিতর্ক করা। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের মধ্য হতে গোঁড়ামি দূরীভূত হয়। সত্য গ্রহণের জন্য মন তৈরি হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। কারণ, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে নিজস্ব আকীদা ও বিশ্বাস। যেগুলো দীর্ঘ অনুশীলনের কারণে সেসকল রীতি-নীতির প্রতি ঐ সম্প্রদায়ের গভীর সম্পর্ক ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকেই চায়, তার মতাদর্শকে যেকোনো দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ বিধানের প্রতি যারা এখনও বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারা যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করছে তা প্রমাণ করার জন্য তাদের সাথে বিতর্ক করা যাবে, যদি তারা বিতর্কের জন্য আহ্বান করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

তুমি তোমার রবের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং বিতর্ক করো উত্তম পন্থায় (Al-Qurān, 16:125)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মূলত এ আদেশ প্রদান করেছেন, যারা এখনও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি তাদের সাথে যুক্তিনির্ভর বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সুন্দর ভাষায় ভদ্রভাবে শান্তি, সম্প্রীতি ও মুক্তির পথ ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন,

أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب.

তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি বিতর্ক করতে চায় তার সাথে তা হবে সুন্দর ভঙ্গিতে, নম্র-ভদ্রভাবে এবং সুন্দর ভাষায় (Ibn Kathīr 1999, 4/613)।

কেননা, সমাজের সম্প্রীতি রক্ষা করা ইসলামী আইনের অন্যতম চেতনা।

সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশনা

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাদের উপর প্রেরিত আসমানী নির্দেশনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

যারা আপনার উপর অবতীর্ণ কিতারের উপর ঈমান আনয়ন করে এবং আপনার পূর্বে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (Al-Qurān, 02:04)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

يصدقون بما جئت به من الله، وما جاء به مَنْ قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم.

আল্লাহর পক্ষ হতে যা তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না এবং তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা এসেছে তা অস্বীকার করে না (Ibn Kathīr 1999, 1/171)।

একজন মুসলিমের এরূপ বিশ্বাসের কারণে কোনো অবস্থাতেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের বা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায়কে অমর্যাদা কিংবা অসম্মান করতে পারে না। ইসলাম গোটা মানব জাতির বৃহত্তর ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই একজন মুসলিম যেমন মুহাম্মদ স.-এর উপর ও তার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন এর উপর ঈমান আনবে, একইভাবে অন্যান্য সকল ঐশী গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত আছে, যেগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া, ফাসাদ পরিত্যাগ করে বিশেষভাবে মানবজাতির ঐক্য গঠনের যে নির্দেশনা দিয়েছে তা লক্ষণীয়। যেমন- আল-কুরআনের নির্দেশনা-

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

মুমিনগণ আপনার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলির ওপর ঈমান আনে (Al-Qurān, 04:62)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন,

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার কাছ থেকে। আমরা তাদের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত (Al-Qurān, 03:84)।

উস্কানিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

মানুষের মাঝে কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ছড়ায় এরূপ কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এটাই ইসলামের বিধান ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ সংঘাত ও সহিংসতায় উস্কানি দেয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করো। এমনও তো হতে পারে-যাদের উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আবার নারীরাও যেন নারীদের উপহাস না করে, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করবেনা এবং মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটি বড় অপরাধ। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা জালিম। হে মুমিনগণ, তোমরা কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু (Al-Qurān, 49:11-12)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইমাদুদ্দীন বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও নিষেধ করেছেন (Ibn Kathīr 1999, 7/376)। এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, একজনের প্রতি অন্যজনের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, শত্রুতার সূত্রপাত হয় এমন সকল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যেমন

একে অপরকে অহেতুক দোষারোপ না করা, কোনো ব্যক্তিকে মন্দ নামে আখ্যায়িত না করা। কেননা, এতে যে কোনো ব্যক্তি তার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অযথা কারো সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া ও গীবত করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, অনুরূপ অন্যের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতেও নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে রাসূল স. বলেছেন-

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا.

তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করো না। একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করো না, পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপর থেকে পৃথক থেকো না এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও (Al-Bukhārī 2002, 1519, 6064)।"

আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সংলাপ

সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সংলাপ ও পারস্পরিক আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ধর্ম বিশ্বাসে গোঁড়ামি ও মূর্খতার কোনো স্থান নেই। কারণ সংলাপের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং মানুষের কাছে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আন্তঃ-ধর্মীয় সংলাপের ধারণাটি মূলত আল-কুরআনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেখানে আল্লাহ তা'আলা কিতাবী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

বল, হে কিতাবীগণ, এসো সেই কথার দিকে যা তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে অভিন্ন (Al-Qurān, 03:64)।

তাছাড়াও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য হলো, পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পাদন করা। যে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় পরামর্শ ভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করা। বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সহিংসতা লেগেই আছে। এ সংঘাতকে সম্প্রীতিতে রূপান্তরের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংলাপ নবী মুহাম্মদ স. এর সময়ে অনেক জটিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছিল। যেমন নবী

মুহাম্মদ স. যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন তিনি মদিনার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ করে একটি সন্ধিপত্রও রচনা করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান হিসাবে পরিচিত। তাছাড়াও নবী মুহাম্মদ স. হুদায়বিয়াতেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করে একটি যুদ্ধাবস্থাকে সম্প্রীতির পরিবেশে পরিণত করেছিলেন। এখানেও একটি সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন, যা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসাবে পরিচিত।

উপসংহার

জীবনধারণের জন্য মানুষের বহুমাত্রিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তার মধ্যে অতি মৌলিক হলো চারটি বিষয়। এগুলো হলো স্বাধীনতা, সত্য, সুবিচার ও সুখ। এদের মধ্যে সুখ হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সত্য ও সুবিচার প্রয়োজন। আবার এ তিনটির কোনোটিই অর্জন হবে না, যদি স্বাধীনতা না থাকে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সকল মানুষের জন্য এ চারটি বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে । মানুষের মাঝে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা কিংবা ভূখণ্ড আলাদা হওয়ার পরেও ইসলাম এমন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে, যার ছায়াতলে সমস্ত মানুষ শান্তির অমীয় সুধা লাভ করতে পারে। মানবতার মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্য, বিদ্বেষ, বৈরী মনোভাব, ও প্রতিহিংসার সংক্রামিত ব্যাধি নিরসনে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিষবাষ্প থেকে রেহাই দিতে পারে। বিশ্ব পরিবারকে একটি মানবীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা করে মানব জীবনের পরম সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করার ইতিহাস তো একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থায়ই রয়েছে।

Bibliography

Al-Qurān

‘Abdul Latīf, Mohammad. 2018. *Islamer Shresthoetto O Anto Samprodayik Sampriti*. Dhaka: Boi Polli.

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash‘as. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Ahmad, Imām Ahmad Ibn Hanbal. ND. *Al-Musnad*. Cairo: Muassasah Qurtubah.

Al-Badawī, Jamal. 2016. Onnanno Communitir Sathe Musalmander Somporko. Available on: https://cscsbd.com/1314

Al-Bukhārī Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jamī‘ Al-Sahīh (In 1 Vol)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Tabarānī, Sulaimān Ibn Ahmad. ND. *Al-Mu‘jam al-Kabīr*. Cairo: Maktabah Ibn Taymiyyah.

Al-Tabarī, Muhammad Ibn Jarīr. 1387H. *Tārīkh al-Rusul Wa al-Muluk*. Beirut: Dār al-Turāth.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. 1417H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif.

Anwārī, Muhammad ‘Abdur Rahman. 2005. *Islami Dawater Poddoti O Adhunik Prekkhapot*. Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought.

Fadzil, Ammar. "Religious tolerance in Islam: theories, practices and Malaysia’s experiences as a Multi Racial Society." *Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077)* 8 (2011): 354-360.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl. 1988. *Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*. Beirut: Dār Yahyā’ al-Turāth al-‘Arābī.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl. 1999. *Tafsīr al-Qurān al-‘Ajīm*. Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Tayyibah.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ (In 1 Vol)*. Riyadh: Dār Ṭayyiba.

Nu‘mānī, Allamah Shiblī. 2012. *Al-Farūq*. Dhaka: Imdadia Pustakalaya Ltd.

Qutub, Sayyed. 1412H. *Fī Jilāl al-Qurān*. Beirut: Dār al-Shurūq.

Umar, Badaruddin. 1995. *Samprodayikata*. Dhaka: Mawla Brothers.